أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 86) www.motaher21.net

عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ

"তোমাদের দায়িত্ব তোমাদেরই উপর।"

"Guard your own soul."

সুরা: আল-মায়িদাহ

আয়াত নং :-১০৫

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

হে মুমিনগণ! তোমাদের দায়িত্ব তোমাদেরই উপর। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথ ভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না । আল্লাহ্‌র দিকেই তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তন; তারপর তোমারা যা করতে তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

১০৫ নং আয়াতের তাফসীর:

এ আয়াতের বাহ্যিক শব্দের দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রতিটি মানুষের পক্ষে নিজের ও কর্ম সংশোধনের চিন্তা করাই যথেষ্ট। অন্যরা যা ইচ্ছা করুক, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। অথচ এ বিষয়টি কুরআনের যে সব আয়াতে 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ' করাকে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য এবং মুসলিম জাতির একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করা হয়েছে, তার পরিপন্থি হয়ে যায়। এ কারণেই আয়াতটি নাযিল হলে কিছু লোকের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের সামনে প্রশ্ন রাখেন

এবং তিনি উত্তরে বলেন যে, আয়াতটি ‘সৎকাজে আদেশ দান’-এর পরিপন্থী নয়। তোমরা যদি সৎকাজে আদেশ দান’ পরিত্যাগ কর, তবে অপরাধীদের সাথে তোমাদেরকেও পাকড়াও করা হবে। [ইবন কাসীর; সাদী]

আবুবকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এক ভাষণে বলেন, তোমরা আয়াতটি পাঠ করে একে অস্থানে প্রয়োগ করছ। জেনে রাখ, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে শুনেছিঃ যারা কোন পাপকাজ হতে দেখেও তা দমন করতে চেষ্টা করে না, আল্লাহ তা'আলা সত্বরই হয় তো তাদেরকেও অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত করে আযাবে নিক্ষেপ করবেন। [আবু দাউদঃ ৪৩৪১, তিরমিযীঃ ৩০৫৮, ইবন মাজাহঃ ৪০১৪]

তাই মুফাসসিরগণ এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, তোমরা স্বীয় কর্তব্য পালন করতে থাক। সৎকাজে আদেশ দান’ও এ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো করার পরও যদি কেউ পথভ্রষ্ট থেকে যায়, তবে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। [সা‘দী]

কুরআনের (اِذَا اهْتَدَيْتُمْ) শব্দে চিন্তা করলে এ তাফসীরের যথার্থতা ফুটে উঠে। কেননা, এর অর্থ এই যে, যখন তোমরা সঠিক পথে চলতে থাকবে, তখন অন্যের পথ ভ্রষ্টতা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি সৎকাজে আদেশ দান’-এর কর্তব্যটি বর্জন করে, সে সঠিক পথে চলমান নয়। সা’য়ীদ ইবন মুসাইয়্যাব বলেন, এর অর্থ, যদি সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ কর, তাহলে কেউ পথভ্রষ্ট হলে, তাতে তোমার ক্ষতি নেই, যখন তুমি হিদায়াতপ্রাপ্ত হলে। [ইবন কাসীর]

আল্লাহ তা‘আলা মু’মিন বান্দাদেরকে নিজেদের সংশোধন করে নেয়া ও কল্যাণকর কাজ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। যারা নিজেদেরকে সংশোধন করে নিয়েছে এবং ভাল কাজে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, পথভ্রষ্টরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তারা নিকটবর্তী হোক বা দূরবর্তী হোক।

অনেকে এ আয়াত দ্বারা মনে করে নিজেরাই সংশোধন হয়ে ভাল কাজ করলেই হবে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দেয়ার প্রয়োজন নেই। এরূপ ধারণা ভুল। কারণ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দেয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। এ ফরয ত্যাগ করলে অচিরেই আযাব আসতে পারে। আবূ বাকর (রাঃ)-এ আয়াতের মর্মার্থ যখন অবগত হলেন তখন তিনি বললেন: হে মানব সকল! তোমরা আয়াতকে ভুল জায়গায় ব্যবহার করছ। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি “লোকেরা যখন কাউকে কোন পাপ কাজে লিপ্ত দেখে পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে না তখন সম্ভবত আল্লাহ তা‘আলা অচিরেই আযাব দ্বারা পাকড়াও করবেন। (আহমাদ, তিরযিমী হা: ২১৭৮, আবূ দাঊদ হা: ৪৩৩৮, সহীহ) সুতরাং আয়াতের সঠিক ভাবার্থ হল: অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের বুঝানো সত্ত্বেও যদি তারা খারাপ কাজ থেকে বিরত না থাকে এবং সৎ পথ অবলম্বন না করে তাহলে এ অবস্থায় তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। তোমরা সৎ পথে আছ এবং পাপ হতে বিরত রয়েছে।

অর্থাৎ অমুক কি করছে, অমুকের আকীদার মধ্যে কি গলদ আছে এবং অমুকের কাজে কোন কোন ধরনের দোষ-ত্রুটি আছে, সবসময় এসব দেখার পরিবর্তে মানুষের দেখা উচিত, সে নিজে কি করছে। তার নিজের চিন্তাধারার এবং নিজের চরিত্র ও কার্যাবলীর কথা চিন্তা করা উচিত সেগুলো যেন খারাপ ও বরবাদ না হয়ে যায়। কোন ব্যক্তি নিজে যদি আল্লাহর আনুগত্য করতে থাকে, তার ওপর আল্লাহ ও বান্দার যেসব অধিকার আরোপিত হয় সেগুলো আদায় করতে থাকে এবং সততা ও সঠিক পথ অবলম্বন করার দাবী পূর্ণ করে যেতে থাকে এবং এই সঙ্গে সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা তার কর্মসূচীর অপরিহার্য অংশরূপে বিবেচিত হতে থাকে, তাহলে নিশ্চিতভাবে অন্য কোন ব্যক্তির গোমরাহী ও বক্র পথে চলা তার জন্য কোন ক্ষতির কারণ হতে পারে না।

তাই বলে মানুষ কেবলমাত্র নিজের নাজাত ও মুক্তির কথা ভাববে, অন্যের সংশোধন করার কথা ভাববে না, এটা নিশ্চয়ই এ আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এ ভুল ধারণার প্রতিবাদ করে এক ভাষণে বলেনঃ "হে লোকেরা! তোমরা এ আয়াতটি পড়ে থাকো এবং এর ভুল ব্যাখ্যা করে থাকো। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি, যখন লোকদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যে, তারা অসৎকাজ দেখবে কিন্তু তা পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে না, জালেমকে জুলুম করতে দেখবে কিন্তু তার হাত টেনে ধরবে না তখন অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাঁর আযাব সকলের ওপর চাপিয়ে দেবেন। আল্লাহর কসম! তোমরা লোকদেরকে ভাল কাজ করার হুকুম দাও এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখো, নয়তো আল্লাহ তোমাদের ওপর এমন সব লোককে চাপিয়ে দেবেন যারা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ এবং তারা তোমাদেরকে ভীষণ কষ্ট দেবে। তখন তোমাদের সৎলোকেরা আল্লাহর কাছে দোয়া করবে কিন্তু তা কবুল হবে না।

কিছু লোকের মনে বাহ্যিক এই শব্দাবলীর কারণে সংশয়ের সৃষ্টি হয় যে, নিজেকে সংশোধন করে নেওয়াই যথেষ্ট। আর সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ ধরনের ধারণা সঠিক নয়, তার কারণ হচ্ছে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফরয বিষয়। যদি একজন মুসলিম এই ফরয ত্যাগ করে, তাহলে পথভোলাকে কে পথ দেখাবে? (এই কাজ ত্যাগ করলে কেউ কি সৎপথে থাকতে পারে?) অথচ কুরআন শর্তারোপ করেছে যে, যদি তোমরা সৎপথে পরিচালিত হও তবে। এই আয়াতের মর্মার্থ সম্পর্কে যখন আবু বাকর (রাঃ) অবগত হলেন, তখন তিনি বললেন, 'হে লোক সকল! তোমরা আয়াতকে ভুল জায়গায় ব্যবহার করছ। আমি তো রসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, "লোকেরা যখন কাউকে কোন পাপ কাজে লিপ্ত দেখে এবং পরিবর্তন করার পরিকল্পনা বা চেষ্টা না করে, সম্ভবতঃ আল্লাহ তাদেরকে অচিরেই আযাব দ্বারা গ্রেফতার করবেন।" (আহমাদ, তিরমিযী ২১৭৮, আবু দাউদ ৪৩৩৮নং)

সুতরাং আয়াতের সঠিক ভাবার্থ এই যে, তোমাদের বুঝানো সত্ত্বেও যদি তারা পাপ থেকে বিরত না থাকে এবং সৎপথ অবলম্বন না করে, তাহলে এই অবস্থায় তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না; বরং তোমরা সৎপথে আছ

এবং পাপ করা হতে বিরত আছে। অবশ্য একটি অবস্থায় সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দেওয়া থেকে বিরত থাকা বৈধ, যদি কেউ সে কাজে নিজের মধ্যে দুর্বলতা পায় এবং জীবননাশের আশঙ্কা থাকে, তাহলে এই অবস্থায় "তাতে যদি সক্ষম না হয়, তাহলে হৃদয় দ্বারা; আর এ হল সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক" হাদীসের ভিত্তিতে অনুমতি আছে। উক্ত আয়াতও এই অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত বহন করতে পারে।

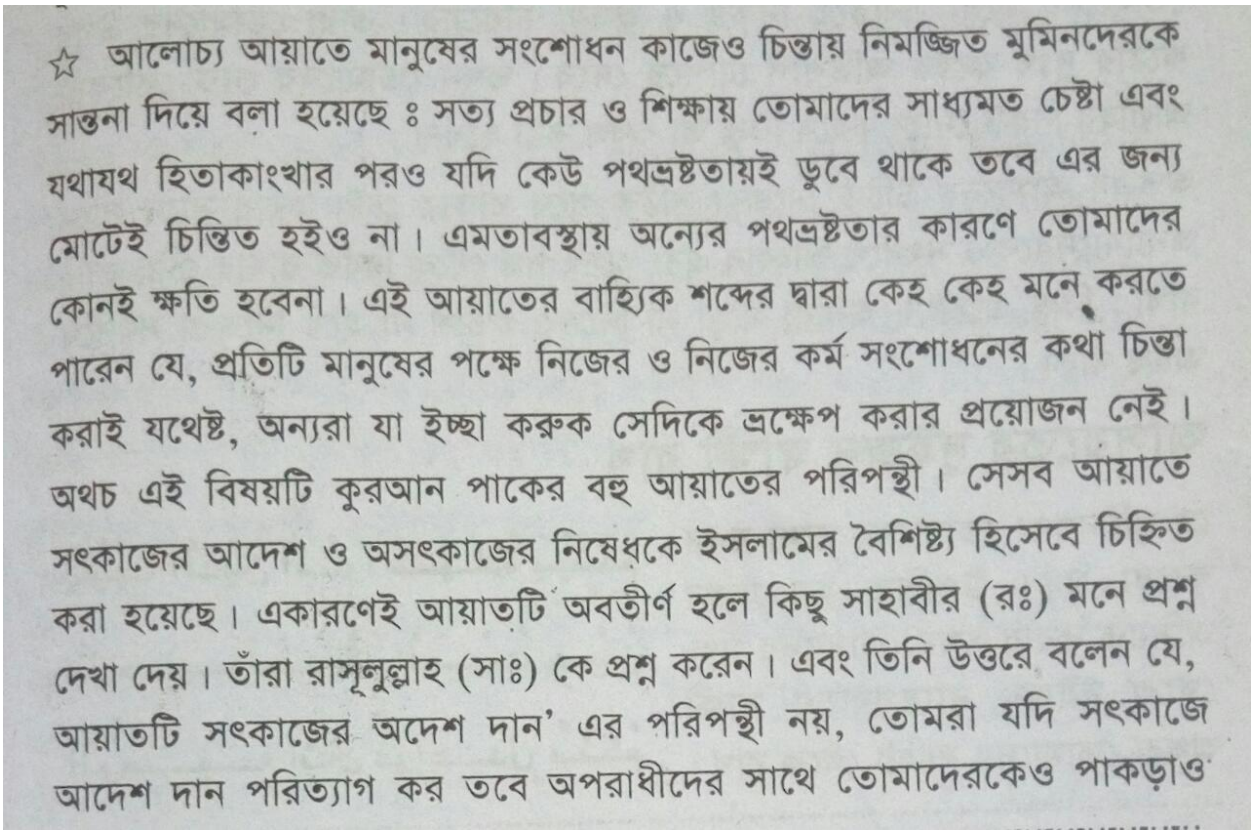

☆ আলোচ্য আয়াতে মানুষের সংশোধন কাজেও চিন্তায় নিমজ্জিত মুমিনদেরকে সান্তনা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ সত্য প্রচার ও শিক্ষায় তোমাদের সাধ্যমত চেষ্টা এবং যথাযথ হিতাকাংখার পরও যদি কেউ পথভ্রষ্টতায়ই ডুবে থাকে তবে এর জন্য মোটেই চিন্তিত হইও না। এমতাবস্থায় অন্যের পথভ্রষ্টতার কারণে তোমাদের কোনই ক্ষতি হবেনা। এই আয়াতের বাহ্যিক শব্দের দ্বারা কেহ কেহ মনে করতে পারেন যে, প্রতিটি মানুষের পক্ষে নিজের ও নিজের কর্ম সংশোধনের কথা চিন্তা করাই যথেষ্ট, অন্যরা যা ইচ্ছা করুক সেদিকে ভ্রক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। অথচ এই বিষয়টি কুরআন পাকের বহু আয়াতের পরিপন্থী। সেসব আয়াতে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধকে ইসলামের বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একারণেই আয়াতটি অবতীর্ণ হলে কিছু সাহাবীর (রঃ) মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে প্রশ্ন করেন। এবং তিনি উত্তরে বলেন যে, আয়াতটি সৎকাজের অদেশ দান' এর পরিপন্থী নয়, তোমরা যদি সৎকাজে আদেশ দান পরিত্যাগ কর তবে অপরাধীদের সাথে তোমাদেরকেও পাকড়াও

করা হবে। আলোচ্য আয়াতে তোমরা নিজের কথা চিন্তা কর এবং সৎপথের পথিক হয়ে থাক- এই অংশে জিহাদ ও সৎকাজে আদেশ দানও অন্তর্ভূক্ত। কারণ এই দুইটি বাদ দিলে নিজের কর্তব্য পূর্ণ হয়না এবং সৎপথেও থাকা হয়না। এগুলো করার পরও যদি কেহ পথভ্রষ্ট থেকে যায় তবে তার জন্য সেই পাকড়াও হতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। বস্তুত মানুষ কেবল নিজের মুক্তির জন্য চিন্তা করবে অপর লোকদের সংশোধনের কোন চিন্তা করবেনা- এই কথা বলার জন্য এই আয়াত নাযিল হয়নি। এই আয়াতের বক্তব্যও তা'নয়। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এই ভুল অপনোদন এবং উহার প্রতিবাদ করে একটি ভাষণ দান করেছেন - তিনি বলেছেন, "হে মানুষ তোমরা এই আয়াতটি পাঠ কর বটে কিন্তু উহার অর্থ ও তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্পূর্ণ ভুল। আমি রাসূল করীম (সঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন - লোকদের অবস্থা যখন এতই খারাপ হয়ে যাবে যে, সে অন্যায় ও পাপ অনুষ্ঠিত হতে দেখবে কিন্তু উহা পরিবর্তন করতে চেষ্টা করবেনা, জালিমকে দেখবে অত্যাচারের তান্ডব সৃষ্টি করতে কিন্তু হস্ত ধরে তাকে বিরত রাখবেনা, তখন খুব অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ সকলকেই তাঁর আযাবের বেষ্টনী দ্বারা পরিবেষ্টিত করে ফেলবেন। আল্লাহর শপথ ভাল কাজের আদেশ করা এবং মন্দ ও পাপ কাজের নিষেধ করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের উপর এমন সব লোককে শক্তিশালী করে বসিয়ে দেবেন যারা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও জঘন্য চরিত্রের। তারা তোমাদের উপর কঠোর দুঃখ কষ্টের অভিশাপ চাপিয়ে দেবে। তখন তোমাদের নেক লোকেরা আল্লাহর নিকট দোয়া করবে কিন্তু তা কবুল করা হবেনা।

অতএব আমাদের উচিত নিজেরা সঠিক পথে থাকার চেষ্টা করার সাথে সাথে অন্যান্যদেরকেও সৎপথে আহ্বান এবং অসৎ পথ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা জারি রাখা। কিন্তু এচেষ্টায় অন্যরা সাড়া না দিলেও হতাশ না হয়ে নিজেরা সৎপথে অটল থাকা।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. সর্ব প্রথম নিজেদেরকে সংশোধন করে নিয়ে সৎ পথে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

২. সৎ পথে আহ্বান করতে হবে অসৎ পথ হতে বাধা দিতে হবে।

৩. দাওয়াত দেয়ার পর কেউ সৎ পথ অবলম্বন না করলে তার জন্য চিন্তার কারণ নেই।

সুরা: আল-মায়িদাহ

আয়াত নং :-১০১

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْۚ وَ اِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْۗ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَاۗ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

হে ঈমানদারগণ! এমন কথা জিজ্ঞেস করো না যা তোমাদের কাছে প্রকাশ করে দেয়া হলে তোমাদের খারাপ লাগবে। তবে কুরআন নাযিলের সময় যদি তোমরা সেসব বিষয়ে জিজ্ঞেস করো তাহলে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হবে। এ পর্যন্ত তোমরা যা কিছু করেছো, আল্লাহ তা মাফ করে দিয়েছেন। তিনি ক্ষমাশীল ও সহনশীল।

১০১ নং আয়াতের তাফসীর:

শানে নুযূল:

এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে তিনটি বর্ণনা পাওয়া যায়:

১. সাহাবী আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুৎবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় একজন লোক বলল: আমার পিতা কে? নাবী বলেছেন: অমুক, তখন

(لَا تَسْأَلُوْا عَنْ أَشْيَاْءَ)

১০১ নং আয়াতটি নাযিল হয়। (সহীহ বুখারী হা: ৪৬১২)

২. সাহাবী ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: মানুষেরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করত। একজন বলল, আমার পিতা কে? অন্য লোক বলল: আমার উট হারিয়ে গিয়েছে। আমার উট কোথায়? তখন তাদের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়। (সহীহ বুখারী হা: ৪৬২২)

(وَإِنْ تَسْأَلُوْا عَنْهَا)

“যদি সেসব বিষয়ে প্রশ্ন কর’অর্থাৎ যেসব বিষয়ে প্রশ্ন করতে নিষেধ করা হয়েছে সেসব বিষয়ে কুরআন অবতীর্ণের সময় প্রশ্ন করলে আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর ওয়াহী করে জানিয়ে দিতেন। এটা আল্লাহ তা‘আলার পক্ষে সহজ। কেননা হতে পারে আমাদের প্রশ্নের কারণে এমন কোন বিধান চলে আসতে পারে, যা পালনে অক্ষম হব বা সংকীর্ণতা চলে আসতে পারে।

যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا من سَأَلَ عن شَيْءٍ لم يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ من أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

সে মুসলিম সবচেয়ে বড় অপরাধী যে ব্যক্তি কোন কিছু জিজ্ঞাসা করল যা হারাম ছিল না ফলে তার প্রশ্নের কারণে হারাম করে দেয়া হল। (সহীহ বুখারী হা: ৭২৮৯, সহীহ মুসলিম হা: ২৩৫৮)

(عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا)

‘আল্লাহ সেসব ক্ষমা করেছেন’ অর্থাৎ যে সকল বস্তু বা বিষয় কুরআন ও সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি সে বিষয়গুলো আল্লাহ তা‘আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতএব সেসব বিষয়ে তোমরা চুপ থাক। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

ذَرُوْنِيْ مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ علي أَنْبِيَائِهِمْ

আমি তোমাদেরকে যে বিষয়ে ছেড়ে দিয়েছি সে বিষয়ে তোমরা আমাকে প্রশ্ন কর না; কেননা আমাদের পূর্ববর্তীগণ অধিক প্রশ্ন ও নাবীদের ব্যাপারে মতানৈক্য করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। (সহীহ বুখারী হা: ৭২৮৮, সহীহ মুসলিম হা: ৩৩৭)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহ তা‘আলা যা ফরয করার তা ফরয করে দিয়েছেন। অতএব তা বিনষ্ট করো না (অর্থাৎ যথাযথ আদায় কর)। তিনি সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, অতএব তা অতিক্রম করো না। যে সমস্ত বস্তু হারাম করে দিয়েছেন তা ভঙ্গ করো না, আর যে সকল জিনিসের ব্যাপারে তিনি (কিছু বলেননি) নীরবতা অবলম্বন করেছেন তা তোমাদের প্রতি দয়াশীল হয়ে করেছেন। ==== ভুলে গিয়েছেন এমন নয়, সুতরাং সে বিষয়ে প্রশ্ন কর না। (মুসনাদ আহমাদ: ৪/১১৫, ফাতহুল বারী. ১৩/২৮০, ইবনু হাজার বলেন: এর শাহেদ রয়েছে)

পূর্ববর্তী জাতি এমন কিছু অবান্তর প্রশ্ন করেছিল যেমন বানী ইসরাঈলের গাভী বিষয়ে, ইয়াহূদীদের কিতাব নাযিলের ব্যাপারে ইত্যাদি। পরে নিজেরাই এর জন্য আফসোস করেছিল।

সুতরাং আমাদের উচিত এমন কোন প্রশ্ন না করা যার ফলে দশজনের কোন উপকার না হয়ে ক্ষতি হয়। অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ। কিন্তু শরীয়তের বিষয়ে অজানা থাকলে কুরআন-সুন্নাহয় জ্ঞানীদেরকে আদবের সাথে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ)

"তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞেস কর" (সূরা নাহল ১৬:৪৩)

কোন কোন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অদ্ভুত ধরনের বিভিন্ন প্রশ্ন করতো। এ প্রশ্নগুলোর সাথে দ্বীনের কোন প্রয়োজন জড়িত থাকতো না এবং দুনিয়ার কোন প্রয়োজনের সাথেও এর সম্পর্ক থাকতো না। যেমন একবার এক ব্যক্তি প্রকাশ্য জন-সমাবেশে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, "আমার আসল পিতা কে?" এমনিভাবে অনেক লোক শরীয়াতের বিধানের ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করতো এবং এভাবে অনর্থক জিজ্ঞাসাবাদ করে এমন সব বিষয় নির্ধারণ করতে চাইতো যা প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ও সঙ্গত কারণেই শরীয়াতের বিধানদাতা নিজেই অনির্ধারিত রেখে দিয়েছেন। যেমন কুরআনে সংক্ষেপে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, হজ্ব তোমাদের ওপর ফরয করা হয়েছে। এক ব্যক্তি এ নির্দেশ শোনার সাথে সাথেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, "এ কি প্রত্যেক বছরে ফরয করা হয়েছে? তিনি এর কোন জবাব দিলেন না? ঐ ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করলো। তিনি এবারও চুপ করে রইলেন। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেনঃ "তোমাদের প্রতি আফসোস, আমার মুখ থেকে হাঁ শব্দ বের হয়ে গেলে তোমাদের জন্য প্রতি বছর হজ্ব করার ফরয হয়ে যাবে। তখন তোমরাই তা মেনে চলতে পারবে না, ফলে নাফরমানি করতে থাকবে।" এ ধরনের সমস্ত অর্থহীন ও অবান্তর প্রশ্ন করা থেকে এ আয়াতে নিষেধ করা হয়েছে।

নবী ﷺ নিজেও লোকদেরকে বেশী বেশী প্রশ্ন করতে ও অনর্থক প্রত্যেকটি ব্যাপারের গভীরে প্রবেশ করে ঘাটাঘাটি করতে নিষেধ করতেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বলা হয়েছেঃ إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِى الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

"মুসলমানদের কাছে সবচেয়ে বড় অপরাধী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে এমন একটি জিনিস সম্পর্কে প্রশ্ন করলো যা লোকদের জন্য হারাম ছিল না, অথচ নিছক তার প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাবাদের কারণে সে জিনিসটি হারাম গণ্য করা হলো।"

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ إِنْ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِن غَيرِ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوا عَنْهَا-

“আল্লাহ তোমাদের ওপর কিছু কাজ ফরয করে দিয়েছেন, সেগুলো ত্যাগ করো না। কিছু জিনিস হারাম করে দিয়েছেন, সেগুলোর ধারে কাছে ঘেঁষো না। কিছু সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেগুলো লংঘন করো না। আবার কিছু জিনিসের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন কিন্তু তা ভুলে যাননি, কাজেই সেগুলোর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ো না।”

এ হাদীস দু’টিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের সন্ধান দেয়া হয়েছে। শরীয়াতের বিধানদাতা যেসব বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন এবং যেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেননি অথবা যে বিধানগুলো সংক্ষেপে দিয়েছেন এবং যেগুলোর পরিমাণ, সংখ্যা বা অন্যান্য বিষয় উল্লেখ করেননি, সেগুলো সংক্ষেপে বা অবিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার কারণ এ নয় যে, বিধানদাতা সেগুলো বর্ণনা করতে ভুলে গিয়েছেন এবং বিস্তারিত বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল কিন্তু তা করেননি বরং এর আসল কারণ হচ্ছে এই যে, বিধানদাতা এ বিষয়গুলোর বিস্তারিত রূপ সংকুচিত ও সীমাবদ্ধ করতে চান না এবং এ বিধানগুলোর মধ্যে মানুষের জন্য প্রশস্ততা ও ব্যাপকতা রাখতে চান। এখন কোন বিষয়ে অযথা প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্থাপন করে তার বিস্তারিত রূপ, নির্দিষ্ট বিষয়াবলী ও সীমাবদ্ধতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে এবং বিধানদাতার বক্তব্য থেকে যদি বিষয়গুলো কোনক্রমে প্রকাশিত না হয়, তাহলে আন্দাজ-অনুমান করে কল্পনা ও উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে কোন না কোন প্রকারে সংক্ষিপ্ত বিষয়কে বিস্তারিত, ব্যাপককে সীমাবদ্ধ এবং অনির্দিষ্টকে নির্দিষ্ট করেই ক্ষান্ত হয়, তবে সে আসলে মুসলমানদের বিরাট বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। কারণ অতি প্রাকৃতিক বিষয়সমূহ যত বেশী বিস্তারিত আকারে সামনে আসবে ঈমানদারদের জন্য জটিলতা তত বেশী বেড়ে যাবে। আর আল্লাহর নির্দেশ ও বিধানের সাথে যত বেশী শর্ত জড়িত হবে এবং এগুলোকে যত বেশী সীমাবদ্ধ করে দেয়া হবে আনুগত্যকারীদের জন্য নির্দেশ অমান্য করার সম্ভাবনা তত বেশী দেখা দেবে।

[১] আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহর বিধি-বিধানে অনাবশ্যক চুলচেরা ঘাটাঘাটি করতে আগ্রহী হয়ে থাকে এবং যেসব বিধান দেয়া হয়নি সেগুলো নিয়ে বিনা প্রয়োজনে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন তুলতে থাকে। আয়াতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন এরূপ প্রশ্ন না করে, যার ফলশ্রুতিতে তারা কষ্টে পতিত হবে কিংবা গোপন রহস্য ফাঁস হওয়ার কারণে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী ঐ ব্যক্তি যে এমন বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে, যা হারাম করা হয়নি। অতঃপর তার প্রশ্ন করার কারণে তা হারাম করে দেয়া হয়েছে।’ [বুখারীঃ ৭২৮৯, মুসলিমঃ ২৩৫৮]

আলোচ্য আয়াতসমূহের শানে-নুযুল এই যে, যখন হজ ফরয হওয়া সম্পর্কিত আদেশ নাযিল হয়, তখন আকরা ইবন হাবেস রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রশ্ন করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের জন্য কি প্রতি বছরই হজ করা ফরয? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। প্রশ্নকারী পুনর্বার প্রশ্ন করলেন। তিনি তবুও চুপ। প্রশ্নকারী তৃতীয় বার প্রশ্ন করলে তিনি শাসনের সুরে বললেন, যদি আমি তোমার উত্তরে বলে দিতাম যে, হ্যাঁ প্রতি বছরই হজ্ব ফরয, তবে তাই হয়ে যেত। কিন্তু তুমি এ আদেশ পালন করতে পারতে না। অতঃপর তিনি বললেন, যেসব বিষয় সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে কোন নির্দেশ দেইনা, সেগুলোকে সেভাবেই থাকতে দাও- ঘাটাঘাটি করে প্রশ্ন করো না। তোমাদের পূর্বে কোন কোন উম্মত বেশী প্রশ্ন করে সেগুলোকে ফরয করিয়ে নিয়েছিল এবং পরে সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়েছিল। আমি যে কাজের আদেশ দেই, সাধ্যানুযায়ী তা পালন করা এবং যে কাজ নিষেধ করি, তা পরিত্যাগ করাই তোমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত। [মুসলিম:১৩৩৭]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়িয়ে এক অভূতপূর্ব ভাষণে বললেন, যদি তোমরা জানতে, যা আমি জানি তবে তোমরা অল্প হাসতে এবং বেশী করে কাঁদতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ মুখ ঢেকে কান্না আরম্ভ করলেন। তখন এক লোক ডেকে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাবা কে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ অমুক। তখন এ আয়াত নাযিল হল।' [বুখারীঃ ৪৬২১, মুসলিমঃ ২৩৫৯]

অপর আরেক বর্ণনায় এসেছে, কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ঠাট্টা করে প্রশ্ন করত। কেউ কেউ বলতঃ আমার বাবা কে? কেউ বলতঃ আমার উট হারিয়ে গেছে, তা কোথায় আছে? এসব ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়। [বুখারীঃ ৪৬২২]

[২] বলা হয়েছে, কুরআন অবতরণকালে যদি তোমরা এরূপ প্রশ্ন কর, যাতে কোন বিধান বুঝতে তোমাদের সমস্যা হচ্ছে, তবে ওহীর মাধ্যমে উত্তর এসে যাবে, যা একান্তই সহজ বিষয়। কিন্তু যদি অন্য সময় হয়, তবে তোমাদের উচিত এ ব্যাপারে চুপ থাকা। [সা'দী, ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন, আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যখন কুরআন নাযিল হচ্ছে, তখন তোমাদের প্রশ্নের উত্তর আসবেই। কিন্তু তোমরা নিজেরা নতুন করে প্রশ্ন করতে যেও না; কারণ, এতে করে তোমাদের উপর কোন কঠিন বিধান এসে যেতে পারে। [ইবন কাসীর]

এতে 'কুরআন অবতরণকাল' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুরআন অবতরণ সমাপ্ত হলে নবুওয়াত ও ওহীর আগমনও বন্ধ করে দেয়া হবে। নবুওয়াতের আগমন খতম হয়ে যাওয়া ও ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এ ধরনের প্রশ্নের ফলে যদিও নতুন কোন বিধান আসবে না এবং যা ফরয নয়, তা ফরয হবে না কিংবা ওহীর মাধ্যমে কারো গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে না, তথাপি অনাবশ্যক প্রশ্ন তৈরী করে সেগুলোর তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া কিংবা অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা নবুওয়াত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধই থাকবে। কেননা, এতে করে নিজের ও অপরের সময় নষ্ট করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'মুসলিম হওয়ার একটি সৌন্দর্য এই যে, মুসলিম ব্যক্তি অনর্থক বিষয়াদি পরিত্যাগ করে।' [তিরমিযীঃ ২৩১৭, ইবন মাজাহঃ ৩৯৭৬]

ইসলামের অন্যতম শিক্ষা এই যে, কোন দ্বীনী কিংবা জাগতিক উপকার লক্ষ্য না হলে যে কোন জ্ঞানানুশীলন, কর্ম অথবা কথায় ব্যাপৃত হওয়া উচিত নয়। তবে যদি কোন বিধানের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে কোন সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এসে থাকে, তবে সেটার বিস্তারিত জ্ঞান জেনে নেয়ার জন্য প্রশ্ন করা হলে সে ব্যাপারে বিশদ বর্ণনা দেয়া হবে। আর যদি কোন বিষয়ে কোন বর্ণনাই না এসে থাকে, তবে সেটার ব্যাপারে নিরবতা পালন করাই হচ্ছে সঠিক নীতি। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি যতক্ষণ কোন বিষয় পরিত্যাগ করি ততক্ষণ তোমরা আমাকে ছাড় দাও; কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ তাদের নবীদেরকে বেশী প্রশ্ন এবং বেশী বাদানুবাদের কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে'। [মুসলিম: ১৩৩৭] [ইবন কাসীর]

[৩] আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে, এক. আল্লাহ তোমাদের অতীতের প্রশ্নগুলোর কারণে পাকড়াও করা ক্ষমা করেছেন। [জালালাইন] দুই. যে সমস্ত বিষয়ে তোমরা প্রশ্ন করছ আল্লাহ তা'আলা সেগুলোর বর্ণনা করা ছেড়ে দিয়েছেন, যাতে বান্দাদেরকে এর পরিণতি থেকে নিরাপত্তা প্রদান করতে পারেন। [মুয়াসসার]

☆ এমন অনেক বিষয় আছে যা সংগত কারণেই আমাদের নিকট বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে এগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করা হলে আমাদের দুঃখ দুর্দশা বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ আমাদেরকে ততটুকুই বর্ণনা করেছেন যতটুকু মানলে আমাদের জন্য পালন করা সহজ হবে। এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলো আমরা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে বুঝতে অক্ষম। এগুলোর পেছনে লেগে থাকা বোকামী। রাসূল (সাঃ) এর সময় কোন কোন সাহাবী (রাঃ) এমন ধরনের প্রশ্ন দুইবার তিনবার রাসূল (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন প্রত্যেক বছরই কি হজ্জ ফরজ করা হয়েছে? তখন রাসূল (সাঃ) তাঁকে বললেন- তোমার জন্য আফসোস আমার মুখ থেকে যদি তোমার প্রশ্নের জবাবে হাঁ বের হত তবে প্রত্যেক বছরই হজ্জ করা ফরয হয়ে যেত। কিন্তু তোমরাই তা পালন করতে সমর্থ হতে না। বরং ইহার নাফরমানী করা শুরু করে দিতে। এই ধরনের প্রশ্ন করতে আলোচ্য আয়াতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। হাদীসে রাসূল (সঃ) উল্লেখ করেছেন - "আল্লাহ তা'আলা কিছু ফরজ কাজ তোমাদের প্রতি ধার্য করেছেন তা নষ্ট করোনা, কিছু জিনিস হারাম করেছেন। সেগুলোর কাছেও যেওনা। কিছু সীমাও

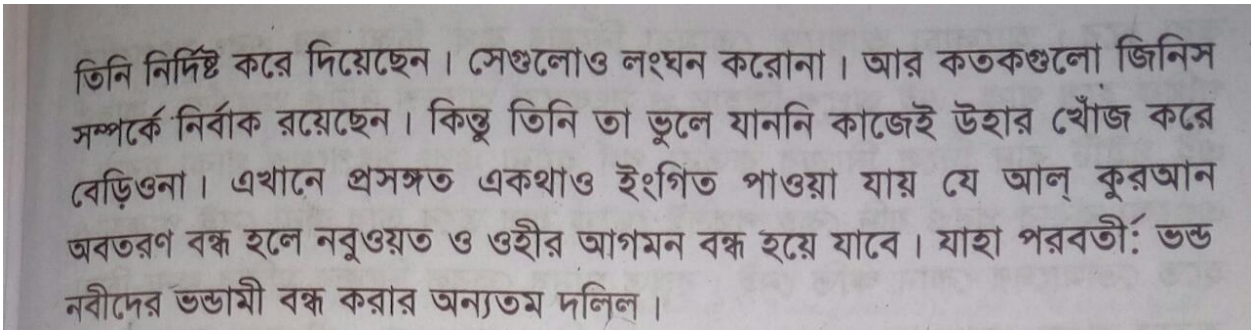
তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সেগুলোও লংঘন করোনা। আর কতকগুলো জিনিস সম্পর্কে নির্বাক রয়েছেন। কিন্তু তিনি তা ভুলে যাননি কাজেই উহার খোঁজ করে বেড়িওনা। এখানে প্রসঙ্গত একথাও ইংগিত পাওয়া যায় যে আল্ কুরআন অবতরণ বন্ধ হলে নবুওয়ত ও ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাবে। যাহা পরবর্তী: ভন্ড নবীদের ভন্ডামী বন্ধ করার অন্যতম দলিল।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. অহেতুক প্রশ্ন করা দূষণীয়।

২. আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের প্রতি দয়ালু।

৩. পূর্ববর্তী জাতি অহেতুক প্রশ্ন করে বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল।

৪. এমন কিছু কাজ রয়েছে যা বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়।